সবগুলো অতিপ্রাকৃত
এবং একটি প্রাকৃত

[অতিপ্রাকৃত গল্প]

সবগুলো অতিপ্রাকৃত এবং একটি প্রাকৃত

সালেহা চৌধুরী

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস

নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883

পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো, এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99579-1-1

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

সবগুলো অতিপ্রাকৃত এবং একটি প্রাকৃত
সালেহা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫ উপলক্ষে মুদ্রিত
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : প্রিন্ট ওয়ার্কস, ২৯ মিরপাড়া, আমুলিয়া রোড, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সংগীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ৩০০ টাকা

Shobgulo Otiprakrito Ebong Ekti Prakrito
by Saleha Chowdhury

First published in hardback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer

Printed and bound in Bangladesh

উ ৎ স র্গ

আজহার ফরহাদ
শুভনিলয়েষু

পরিচয় অল্পদিনের
আমার আপন অনেকদিনের

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানো

আগে একটি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে বই লিখেছিলাম। এবার আরেকটি। লন্ডনে অনেক বছর আছি বলে এখানে এসেছে লন্ডন বা ব্রিটেন। আছে আলেকজান্ডার পুশকিনের একটি বড় গল্পের অনুবাদ। গল্পটি অতিপ্রাকৃত। অতিপ্রাকৃত অর্থ যা বাস্তবে ঘটে না। তবে আমি ভাবি, আসলে এগুলো তো আমাদের জীবনেই ঘটে। তাহলে বাস্তব নয় কেন? বাস্তব বা অবাস্তব যা-ই হোক, এ চলছে এবং চলবে। এবং বিষয়টি আমার প্রিয়। ওই যে শেক্সপিয়ার বলেছেন না, হোরেশিও এই পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে। যার অর্থ সবসময় পরিষ্কার নয়। আমি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি অনেক তথ্য ও উপাত্ত। সবকিছু আমার কল্পনা নয়। তারপরও কল্পনা থাকে। শেষের গল্পটি বলতে চাই অতিপ্রাকৃত নয়। তারপরেও বলতে পারি, এখানেও এমন ঘটনা আছে যাকে অতিপ্রাকৃত বলা যায়। পাঠক আপনাদের ইচ্ছা, শেষ গল্পটিকে আপনারা কী বলবেন।

আশা করি গল্পগুলো আপনারা উপভোগ করবেন।

সালেহা চৌধুরী
লন্ডন। বসন্তকাল। ২০২৪

গল্পধারা

স্পেডের রানি | ১১ টাওয়ার অব লন্ডনের নানা ঘটনা | ৪৩
বাতারসির বামন ভূত | ৪৮ কনজিউরিং বা জাদুকর ভূত | ৫২
বরফে পায়ের ছাপ—হিমালয়ের ইয়েতি | ৫৬
আমি বাড়ি যাব | ৬০ যেতে যেতে কোন অনন্তে | ৬২
প্রবাসে প্রেমিকা | ৬৬ জেলখানাই কি শেষ | ৭২
আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় | ৭৮ হায়াত | ৮৯

স্পেডের রানি

একদিন সন্ধ্যায় নারুমভ নামের হাউজগার্ড কার্ড গেমে হেরে যায়। তারা টাকা দিয়ে খেলে, কাজেই হার-জিত থাকে। গভীর ঘন শীতার্ত রাত আপন মনে বয়ে চলে। কেউ সেইসব খেয়াল করে না। যখন খেলা শেষ হয় ওরা সকলে সাপার খেতে বসে। যারা আগেভাগে জিতে খেলা শেষ করেছে তারা প্রাণভরে খায়। আর বাকি যারা হেরেছে বেশ একটু গম্ভীরভাবে বসে থাকে। বাড়ির মালিক প্রশ্ন করেন, তুমি কেমন খেলেছো সুরিন?

হেরে গেছি যথারীতি। কার্ড গেমে আমার ভাগ্য সবসময় বড় খারাপ। কখনো আমি অন্যমনস্ক হইনি বা জিতব ভেবে আত্মহারা হইনি। তারপরেও হেরে গেলাম।

তুমি কেমন খেলেছো জানি না। তোমার কি খেলায় জেতার জন্য লোভ ছিল না?

সুরিন বলে, এখন তাহলে হারমান কেমন আছে? কী ভাবছে? একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের নাম করে ও। সে কখনো খেলে না। কেবল বসে বসে খেলা দেখে।

বলে হারমান, আমি কখনো খেলায় ভেসে যাইনি। আমার এই অবস্থা নাই যে আমি খেলায় জেতার জন্য বসব।

হারমান হলো জার্মান। ও তো সারাক্ষণ পেনি পেনি হিসাব করে। টমস্কি বলে—যদি কারো কার্ড খেলা আমাকে বিস্মিত বাকরুদ্ধ করে সে আমার দাদিমা কাউন্টেস আনা ফেডটনা। টমস্কি আবার জানায়।

যারা সেখানে বসে ছিলেন বলেন তারা কেমন? কী সে খেলা, যা তুমি কখনো বুঝতে পারোনি?

আমি যেটা বুঝিনি সেটা এই—এখন কেন আমার দাদিমা আর খেলতে চান না।

এতে অবাক হবার কী আছে? একজন আশি বছরের বৃদ্ধা কার্ড খেলতে চান না। নারুমভ বলে।

তার মানে তুমি আমার দাদিমা সম্পর্কে কিছুই জানো না? টমস্কি বলে।

না তো। সত্যি বলছি আমি তার ব্যাপারে কিছুই জানি না।

জানো না? তাহলে কান পাতো, আমি পুরো ঘটনা বলছি।

আজ থেকে ষাট বছর আগে আমার দাদিমা প্যারিস গিয়েছিলেন বেশ একটু রাগ করে। সকলে তাকে দেখতে এসেছিলেন। সেকালে মহিলারা সবসময় ফারো খেলতেন। দাদিমা রেগে একজনকে খুন করতে গিয়েছিলেন, খুব রাগ ছিল তার। একসময় দাদিমা ফারো খেলে অনেক টাকা হেরেছিলেন। ডিউক অব অরলিন্স তার সঙ্গে খেলছিলেন। বাড়িতে এসে তিনি তাঁর বিউটিস্পট চিমটি দিয়ে তুলতে তুলতে আর পেটিকোট জড়ো করতে করতে দাদাজানকে বলেছিলেন তার হেরে যাবার কথা। আর দাদাজানকে বলেছিলেন তার এই হেরে যাওয়াতে যা ঋণ হয়েছে সব দিয়ে দেবার জন্য। শোনা যায়, আমার দাদাজান একটা ডামির মতো ঘটনা ছিল দাদিমার কাছে। দিনি দাদিমাকে বাঘের মতো ভয় পেতেন। দাদাজান তখন হিসাবপত্র করে বলেছিলেন, তাঁর স্বনামধন্য স্ত্রী এই ছয়মাসে হাফ এ মিলিয়ন টাকা হেরেছে। রেগে একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ধরে এনেছিলেন হিসাবপত্র করবার জন্য। বলেছিলেন, মস্কো হলে টাকাটা তিনি দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ওখানে এমন কোন সম্পত্তি নাই যা দিয়ে এতগুলো টাকা তিনি দিতে পারবেন। দাদিমা দাদাজানের মুখে এক থাপ্পড় মেরে ঘুমাতে চলে গিয়েছিলেন। দাদিজান পরদিন বলেছিলেন, আমার থাপ্পড় খেয়ে তোমার হয়তো জ্ঞান হয়েছে। এখন বলছি তুমি হলে একজন প্রিন্স। তুমি

কোনো ঘোড়ার গাড়ির ড্রাইভার না। দাদাজান বলেছিলেন এমন কোনো কথা—তিনি ঘোড়ার গাড়ির ড্রাইভার নন, আবার তিনি প্রিন্সও নন। এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না। এরপর দাদিমা ভেবে পাননি কী করবেন তিনি।

এরপর দাদিমার সঙ্গে একজন মস্ত নামকরা লোকের আলাপ হয়েছিল, যার নাম কাউন্ট ডি সেন জারমেন। তার সম্বন্ধে নানা সব গল্প আছে। তিনি হলেন জু। তিনি জীবনের সঞ্জীবনী সুধা বের করেছিলেন। তিনি ফিলোসফার স্টোন জানতেন—এমনি নানা কথা। তিনি ছিলেন ভবঘুরে, নিজেকে খুব কেউকেটা মনে করতেন। যদিও এইসব কথা তার সম্বন্ধে বলা হয়, আসলে তিনি খুব সম্মাননীয় একজন ছিলেন। সকলে তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। আমার দাদিমা জানতেন সেন্ট জারমেনের অনেক টাকাপয়সা আছে। দাদিমা তাঁকে একটা চিরকুট লিখে বলেছিলেন, তিনি যেন অনতিবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করেন। এরপর তিনি এসে যা জানলেন সেটা এই—দাদিমার স্বামী তাকে টাকা দেয়নি। তার অনেক ঋণ। এবং তিনি এই বন্ধুর বদান্যতার ওপর নির্ভর করছেন। সেন্ট জারমেন একটু অবাক হলেন। বলেন তিনি—তুমি যে পরিমাণ টাকা চাইছো সেটা আমি তোমাকে দিতে পারি। এবং তুমি সময়মতো সেটা আমাকে শোধ করতে পারো। আরেকটা উপায় আছে, যেভাবে তুমি আমার টাকা শোধ দিতে পারো।

শোধ দেব? এখন তো আমার কাছে কোনো টাকা নেই।

এরপর তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আসরে সকলে ভালো করে বসে। কী সেই সিক্রেট বা কী সেই গোপন ব্যাপার?

সেদিন সন্ধ্যায় সেন্ট জারমেন তাকে নিয়ে এসেছিল একটা বড় জুয়ার আড্ডায়। সেখানে সেন্ট জারমেন বসেছিলেন টাকা নিয়ে। দাদিমা অল্প কিছু টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নির্বাচন করেছিলেন তিনটি কার্ড। পরপর তিনটা কার্ড জিতেছিল।

একেবারে বিরাট ভাগ্য। সমবেত চিৎকার।

হারমান বলে, একটা বানানো গল্প। টমস্কি তখন বলে, মোটেই কোনো বানানো গল্প নয়। বলে আর একজন, কার্ডগুলোতে বোধ হয় কোনো গোপন চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল। টমস্কি বলে, ঘটনা তা নয়। নারুমভ বলেন, তোমার দাদিমা কার্ডগুলো কী হবে সেটা টেলিপ্যাথিতে দেখেছিলেন। তুমি কেন সেই ফরমুলা জেনে নিলে না। এই জাদুবিদ্যা তুমি জানলে না এখনো?

আমি কেন? দাদিমার চারজন ছেলে ছিল তারাও কেউ জানতো না ঘটনার আসল কথা। ওরা সকলে জুয়া খেলতো, কিন্তু দাদিমা কাউকে কিছু বলেননি। এই গল্প আমার দাদা কাউন্ট ইভান ইলিচ বলেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, এ গল্প কাউকে বলবেন না। চাপলিস্কি জুয়ায় অনেক টাকা হেরেছিলেন। একশো হাজারের মতো। একেবারে নাজেহাল অবস্থা তার। দাদিমা তখন ভীষণ একটু মায়ায় পড়ে যান। তিনি তাকে গোপন তিনটি নাম্বার বলেছিলেন। বলেছিলেন, টাকা জেতার পর তিনি যেন এই নম্বর নিয়ে কখনো কারো সঙ্গে গল্প না করেন বা জীবনেও আর না খেলেন। চাপলাস্কি দাদিজানের দেওয়া তিনটি নম্বর দিয়ে খেলেছিলেন। প্রথম কার্ডে পঞ্চাশ হাজার বেট। এর পরের কার্ডে তিনি পরিমাণ ডবল করেন এবং জেতেন। এর পরের বার যা জেতেন তাতে তার অনেক টাকা জমেছিল।

তখন সকলে বলে, আর গল্প নয়। আরে বাবা এ যে একেবারে ছয়টা। চল চল ঘুমাতে যাই। কী সব বেটের গল্প!

দুই

আয়নার সামনে বৃদ্ধা কাউন্টেস বসে ছিলেন। তিনজন কাজের মেয়ে তাকে ঘিরে বসে ছিল। একজন মেয়ে একটা রুজের কৌটা হাতে,

আরেকজন কিছু ক্লিপ, অন্যজনের হাতে একটি বনেট। সেখানে আলোর মতো রিবন ঝুলছে। এখন কাউন্টেসের শরীরে আর কোনো রূপ নেই। তাই বলে রূপচর্চা হবে না সেটা তো হয় না। তাই সাজগোজ করতে সত্তরের দশকের সবকিছু মানেন তিনি। আর সময়ও নেন অনেক বেশি। একজন তরুণী সুচের কাজের সরঞ্জাম নিয়ে জানালার কাছে বসে আছে। একজন অল্পবয়স্ক অফিসার বলে, গুড মর্নিং গ্রান্ডমা। আপনি আমাকে একটু ফেভার করবেন?

পল, কোন ফেভার চাও তুমি? কাউন্টেস বলেন।

শুক্রবারে যে বল হবে সেখানে আমি আমার এক বন্ধুকে আনতে চাই এবং সকলের সঙ্গে পরিচয় করাতে চাই।

ঠিক আছে তাকে আনো এবং আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তুমি কি গতকাল এন-তে গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম। বেশ আমোদপ্রমোদ হয়েছে। সকাল পাঁচটা পর্যন্ত নাচ চলেছে। এলেসটিকায়া দেখতে খুব সুন্দর।

সত্যি নাকি? কী পেলে ওর মধ্যে? ওর দাদিমা ছিল খুব রূপসী। দাদির নাম ছিল মিস ডারিয়া পেট্রোভা।

ও তো সাত বছর হলো মারা গেছে। টমস্কি বলে।

তখন সেই তরুণী চোখ ইশারায় বলে, এই বৃদ্ধা কাউন্টেসের সামনে মরা বা মারা যাওয়া নিয়ে কথা বলবে না। তিনি এমন কথা সহ্য করতে পারবে না। তিনি খবর শুনলেন, কিন্তু তার মধ্যে কোনো চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল না।

উনি মারা গেছেন? আর আমরা কিছু জানি না। মনে আছে যখন আমাদের দুজনকে রানির সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এরপর কাউন্টেস এ প্রসঙ্গে তার দাদির কথা প্রায় একশোবার বলেন। এরপর কাউন্টেস তার কাজের মেয়ে নিয়ে সাজার ঘর থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেলেন।

ঠিক আছে তাহলে পল। লিজাবেটা তুমি এসো, আমাকে উঠতে সাহায্য করো। কোথায় গেল আমার নস্যির কৌটা? কাউন্টেস বলেন।

লিজাভেটা বলে, তুমি কোনজনকে আমাদের এই কাউন্টেসের সঙ্গে আলাপ করাতে চাও?

নারুমভ। তুমি কি ওকে জানো? টমস্কি জানায়।

উনি কি সৈন্য, না সাধারণ নাগরিক?

সৈন্য, জবাব দিল টমস্কি।

উনি কি একজন ইঞ্জিনিয়ার?

না না, ইঞ্জিনিয়ার নন। অশ্বারোহী সৈনিক। তোমার কেন মনে হয়েছিল উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। তখন সেই তরুণী হেসে ওঠে। পর্দার ওপার থেকে কাউন্টেস বলেন—পল, তুমি আমাকে কিছু উপন্যাস দিও তো। কিন্তু আজকের দিনে যেসব লেখা হয় সেসব নয়।

মানে কী বলতে চান আপনি?

এমন বই যেখানে খুনোখুনি নেই। মা অথবা বাবাকে মেরে ফেলা নেই। কোনো ডুবন্ত বা ভাসমান শরীর নয়। ওইসব ডুবন্ত শরীর-টরির আমার ভালো লাগে না। ওইসব ভয়ভীতি দেখানো আমি পছন্দ করি না।

এমন বই এখন লেখা হয় না। তবে যদি পুরোনো কালের রাশিয়ান নভেল পড়তে চান তাহলে এমন সব কাহিনি থাকতে পারে যা আপনার পছন্দ।

এমন আছে নাকি? প্রিয় ছেলে তুমি ওইসব বই আমাকে পাঠিয়ে দিও।

গ্রান্ডমা আমাকে ক্ষমা করবেন। এখন আমার যেতে হবে। টমস্কি জানায়। তিনি আবার বলেন, কী করে ভাবলে তুমি লিজাভেটা, নারুমভ একজন ইঞ্জিনিয়ার?

তখন টমস্কি ওই সাজপোশাকের ঘর থেকে চলে গেছে। আর লিজাভেটা তখন একা। সে কাজ ফেলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। সে সময় একজন তরুণ অফিসার জনালার সামনে দিয়ে চলে যায়, যেটা দেখে লিজাভেটার গাল লাল হয়ে ওঠে। এবার সে তাড়াতাড়ি সেলাই তুলে নেয় এবং সেলাইয়ের ওপর মাথা রেখে কাজ

করতে থাকে। তখনই কাউন্টেস পুরো পোশাক পরে ঘরে প্রবেশ করেন। বলেন তিনি, লিজাভেটা একটা গাড়ির অর্ডার করো। আমরা একটু বেড়াতে যাব। এরপর লিজাভেটা তার সেলাই রেখে দেয়।

ঘটনা কী লিজাভেটা? তুমি কি কানে শুনতে পাও না। আমি বলছি গাড়ি অর্ডার করো, তুমি তা করছো না। এই মুহূর্তে গাড়ি ডাকতে পাঠাও।

এখনই যাচ্ছি। এই বলে লিজাভেটা দৌড়ে বাইরে চলে যায়। তখন একজন চাকর ঘরে প্রবেশ করে। তার হাতে বেশ কয়েকটা বই। সেগুলো প্রিন্স পাভেল আলেক্সাজান্ডারনোভিচের কাছ থেকে এসেছে।

লিজাভেটা কোথায় তুমি? ঈশ্বরের দোহাই লাগে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

আমি পোশাক পরতে গেছি।

সেসব করবার অনেক সময় পাবে। তাড়াতাড়ি এখানে আসো। একটা বই খুলে পড়তে শুরু করো। এরপর লিজাভেটা একটা বই খোলে। আর পড়তে শুরু করে। বেশ কয়েক লাইন পড়ে যায়।

একটু জোরে পড়ো। আমার কাছে চলে এসো। পাদানিটা কাছে এনে বসো। তুমি কি আরেকটু জোরে পড়তে পারো না। বলেন এবার কাউন্টেস—রাবিশ বই। তারপরেও আরো দুই পাতা পড়ো। কাউন্টেস হাই তুলতে থাকেন। এবার কাউন্টেস চিৎকার করে বলেন, বইটা ফেরত পাঠাও। পাভেলকে ফেরত পাঠাও। ধন্যবাদ দিতে ভুলো না। এবার লিজাভেটা বলে, গাড়ি রেডি। তিনি লিজাভেটার দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি পোশাক পরোনি কেন বাইরে যাবার? তোমার জন্য আমার সবসময় দেরি করতে হয়। এটা এখন আর সহ্য করতে পারছি না। লিজাভেটা তাড়াতাড়ি কাপড় বদলাতে ছুটে যায় এবং বলে না কাপড় বদলাতে বদলাতে সে ছুটে এসেছে। দুই মিনিট পরে কাউন্টেস তাকে আবার ডাকেন। বেল বাজাতে থাকেন প্রাণপণে। তিনজন কাজের মেয়ে ছুটে আসে। ছুটে আসে পোশাক পরানোর লোকটিও। তোমরা তাড়াতাড়ি লিজাভেটাকে গিয়ে বলো, আমরা অপেক্ষা করছি।

লিজাভেটা এবার কোট আর হ্যাট পরে সেখানে হাজির।

যাক অবশেষে তুমি এলে এখানে ঝকঝকে পোশাকে। এমন পোশাকের দরকার কী, শুনি? বাইরে গিয়ে ঝলমল করবে তাই কি? বাইরে কি ঝড় অছে?

আমার হাইনেস! বাইরেটা একেবারে ঝকঝকে। এক ফোঁটাও বাতাস নেই। সেই পোশাক পরানোর ভ্যালেট বলে।

তোমার যা মনে হয় তুমি তাই বলো। জানালার ওপরের দিকটা খোলো তো দেখি। যা ভেবেছিলাম তাই। একেবারে ঝড়ো বাতাস। একেবারে হাড় জমানো বরফ। গাড়িকে চলে যেতে বলো। লিজাভেটা আমরা কোথাও যাব না। তোমার এমন পুতুল সাজবার দরকার নেই।

আর লিজাভেটা ভাবছে এই আমার জীবন। কখন যে কী হয় বুঝতে পারি না। কখন যে কী আদেশ মাথার ওপর নেমে আসে তার ঠিক নেই। লিজাভেটা বেচারি খুবই দুর্ভাগ্যের একজন। হতাশা এসে যখন তখন ওকে গ্রাস করে। সে জানে অন্যের ওপর নির্ভর করবার ভেতরে যে হতাশা তা কখনো একজনকে একেবারে গ্রাস করতে পারে। যে রুটি কোনো আগন্তুক দেয় তা কি সবসময় ভালো? যে সিঁড়ি আগন্তুকের সেটা কি সঠিক সিঁড়ি? তার গর্ব কি সবসময় ঠিকমতো সে রাখতে পারে? সেও তো বিরূপ হয়ে ওঠে। কাউন্টেস তেমন একজন নন যিনি অন্যকে হিংসা করেন, কিন্তু বড় বেশি একগুঁয়ে। যা মনে হয় তা-ই করেন। কারো কথা শোনেন না। একধরনের ঠান্ডা স্বার্থপরতা তার ভেতরে কাজ করে। সমাজের এই শ্রেণির নারী অনেক সময় এমনই হয়ে থাকে। যেমন কেউ কেউ অল্প বয়সে প্রচুর পান করে। তারপর দেখা যায় বর্তমান সময় থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাউন্টেস নাচের আসরে চুপ করে কোনায় বসে থাকেন। গালে প্রচুর রুজ ঘসে পুরোনো কালের পোশাক পরে একভাবে বসে থাকেন। যখন তিনি কোনো নাচের ঘরে প্রবেশ করেন সকলে ছুটে আসে তার দিকে। কেউ কেউ তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারপর যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার দিকে আর কারো খেয়াল থাকে না। বাড়িতে দাস-দাসী

তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। সকলে তাকে সমীহ করে। সেখানে কঠিন নিয়ম পালিত হয়। দাস-দাসী কে কী করবে ভেবে পায় না। চারপাশে ভিড় করে থাকে। লিজাভেটা এমন একজন—কাউন্টেসের কাজের জন্য প্রাণটাও দিয়ে দিতে পারে। সে চা ঢেলে দেয় কাপে। কিন্তু বেশি চিনি দেওয়ার জন্য বকা শোনে। তারপর যখন জোরে বই পড়ে শোনায়, যেসব জায়গা কাউন্টেসের ভালো লাগে না সেজন্যও সে বকা শোনে। তারপর কাউন্টেস যখন বাইরে যায় ও সঙ্গে যায়। যাওয়ার সময় যদি বাজে আবহাওয়া থাকে তার জন্য বকা শোনে। আর যদি রাস্তার ট্রাফিক খারাপ থাকে সেটাও তার দোষ বলে মনে করা হয়। তার একটা বেতন আছে, কিন্তু সেটা সে পায় মাসের শেষে। তার পোশাক সমাজের অল্প কয়েকজন যে পোশাক পরে তেমন। তার অবস্থা সবসময় ভালো নয়। অনেক সময় করুণ। সবাই তাকে দেখে, তবে তাকে নিয়ে তেমন করে ভাবে না। যদি কারো নাচবার সঙ্গী না থাকে তখনই সে নাচতে পারে। এরপর যখন পার্টির মেয়েদের সাজারঘরে যেতে হয় তার হাত ধরেই যায়। তার নিজেকে নিয়ে গর্ব আছে, কিন্তু সেটা দেখানোর মতো সময় বা সুযোগ থাকে না হাতে। সে অপেক্ষা করে কখন নানা ডেলিভারির লোকজন আসে এবং পার্সেল দিয়ে যায়। তরুণ লোকজন তাকে তেমন সুযোগ দেয় না। কেবল নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। লিজাভেটা যারা নাচে তাদের চাইতে যদিও একশো গুণ ভালো, তারপরেও তার সুযোগ আসে কম। মাঝে মাঝে এইসব কারণে জনসমাগম ফেলে সে চুপ করে নিজের ঘরে গিয়ে এক কোণে বসে কাঁদে। তার সামান্য আসবাবপত্র সেখানে। ছোট আয়না। রং করা বিছানা। ছোট চেস্ট অব ড্রয়ার। একটা চর্বির মোমবাতি কোনোমতে জ্বলে সেখানে।

এইসব ঘটনা ঘটার দুদিন পরে একদিন লিজাভেটা জানালায় বসে সেলাই করছে। দেখতে পায় একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে। সে একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। এবং এই জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। ও চোখ নামায়। সেলাইয়ের কাজে ফিরে যায়। তারপর পাঁচ মিনিট পরে আবার চোখ তোলে। দেখতে পায় সেই তরুণ একইভাবে,

একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর স্বভাব এমন নয়, রাস্তার পাশ দিয়ে যে যাবে তার সঙ্গে ও ছলাকলা করবে। কাজেই এবার ও চোখ নামায় সেলাইয়ে। এবং দুই ঘণ্টা ধরে সেলাই করে। এখন ডিনার দেওয়া হয়েছে। সে উঠে সেলাই করার সেই ফ্রেম থেকে কাপড় খুলে সব গোছায়। এরপর যখন সে আবার তাকায় ওই লোকটাকে দেখতে পায়। এমন ব্যাপার স্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়। সে একটু ভাবে। খাওয়ার পর সে আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। সেখানে কাউকে দেখতে পায় না। তাই লিজাভেটা সে ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলতে চায়। মন থেকে এ ঘটনা চলে যাক।

এর দুদিন পরে ও যখন কাউন্টেসকে নিয়ে বেড়াতে যাবে দেখতে পায় সেই লোকটাকে। যেখান দিয়ে গাড়িটা বাড়ির ভেতরে যাবে সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ একটু উঁচু কলারে তার মুখ ঢাকা। তার কালো চোখ মাথার ক্যাপের নিচে ঝিকমিক করছে। সে যখন গাড়িতে উঠতে চায় কেমন এক অচেনা পাখির ডানা ঝাপটানো শোনে হৃদয়ের ভেতর। এরপর যখন সে বাড়িতে ফিরে আসে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে যায়। দেখে ঠিক সেই লোক তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে আসতে চায়। মনে হয় এমন এক অনুভব তাকে দিশেহারা করছে যার সঙ্গে আগে তার পরিচয় ছিল না।

এরপর যেটা হলো তা এই—তরুণ তেমন করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাসে পরিণত করল। বলা যায় না, সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না, এমন এক অনুভব সে মনের ভেতরে জমে উঠতে দেখল। প্রতিদিন সে দেখে লোকটা এসেছে, জানালায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার চেয়ে থাকার পরিমাণও বেড়ে যেতে লাগল। সে বুঝতে পারল তার গালের ভেতর একটুখানি লাল আভা জেগে ওঠে যখন তাদের দুই চোখ এক হয়। ঠিক এক সপ্তাহ পরে এই অনুভবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে লোকটাকে একটুকরো হাসি উপহার দেয়।

যখন টমস্কি তার বন্ধুকে কাউন্টেসের সঙ্গে পরিচয় করানোর

অনুমতি চাইল তার হৃদয় তখন ধুকপুক করতে লাগল। সে অবশ্য জানে নারুমভ একজন গার্ড। সে ইঞ্জিনিয়ার নয়। কিন্তু কেন সে টমস্কিকে এমন প্রশ্ন করেছিল বুঝতে পারল না। লোকটা ইঞ্জিনিয়ার নাকি? টমস্কি এটা আবার কাকে কাকে বলবে কে জানে।

হারমান নামের লোকটি ছিল একজন রাশিয়ান-জার্মানের ছেলে। ওকে অল্প কিছু টাকা দিয়ে পরপারে চলে গেছে পিতা-মাতা। সে টাকার যে সুদ আসে ও সেখানে কখনো হাত দেয়নি। যে টাকা সে বেতন পায় তাই দিয়েই দিনাতিপাত তার। সে বেশ হিসেব করে খরচ করে। তার সঙ্গে যারা থাকে কেউ তাকে তা নিয়ে কখনো কিছু বলেনি। সামান্য বেশি খরচ করতে সে কখনো রাজি নয়। তার ভেতরে শক্তিশালী ভাবাবেগ কাজ করে। তার ভেতরে বেশ কিছু অতি উৎসাহী কল্পনা আছে। তার ফলে মানুষ যৌবনকালে যেসব আমোদ-প্রমোদ করে ও তা থেকে মুক্ত। একইভাবে কোনো কিছুর জন্য লেগে থাকা ওর স্বভাব। যেমন জুয়া খেলায় তার মন, কিন্তু কখনো ভুলেও সে কোনো কার্ড নিয়ে জুয়া খেলেনি। সে মনে করে এইসব কৃত্রিম ব্যাপার করে সে টাকা নষ্ট করবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার সে কার্ড খেলার টেবিলে সারা রাত বসে থাকবে, দেখবে। দেখে কী করে জুয়াড়িদের ভাগ্য বদলায়। তবে নিজে খেলবে না।

যখন হারমান কাউন্টেসের তিন তাসে ভাগ্য ফেরানোর গল্প শোনে তখন থেকে তার মনে এই গল্প নানাভাবে কাজ করতে থাকে। কী হয় যদি সেই বৃদ্ধা কাউন্টেস তার কার্ডের নম্বর তাকে বলে। সারা রাত একই চিন্তা তার মাথায়। পিটার্সবুর্গের রাস্তায় বার বার ঘুরে ঘুরে একই ভাবনা হয়—যদি কাউন্টেস তার গোপন নম্বর আমাকে বলে। না হলে কোন তাসের পর কোন তাস খেলতে হবে সেটা যদি সে জানতে পারে। কী করে তার স্নেহ ভালোবাসার জগতে যাওয়া যায়? আমি কি তার প্রেমিক হয়ে যাব? কিন্তু তাঁর বয়স তো সাতাশি। কী হবে যদি তিনি দুই-একদিনের ভেতর মারা যান। এ গল্প তো কোনো বানানো গল্প নয়। আমি কি সেই তিনটি নম্বর পেতে চেষ্টা করব না। আহা সে

নম্বর যদি পেয়ে যাই তাহলে আমার ভাগ্য পাঁচ গুণ, না হলে সাত গুণ, না হলে দশ গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। এইসব ভাবতে ভাবতে এই লোক পিটার্সবুর্গের সব রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। এমন একটা পুরোনো বাড়ির সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে যা অনেক কাল আগের ডিজাইনে তৈরি। ঝকঝকে আলো জ্বলা রাস্তা। গাড়ি-ঘোড়া অনেক। আহা সেখানে একজন সুন্দরী বুট জুতোয় একটু শব্দ তুলে গাড়ি থেকে নামছে। ডোরাকাটা মোজা এবং কুটনীতিবিদের মতো জুতো। সেখানে ফারকোট পরিহিত গার্ড আছে। সেখানে গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করে, বাড়িটা কার? পাহারাদারের একদম সামনে সে।

কাউন্টেস। এরপর সে পুরো নাম বলে।

হারমানের সারা শরীর কেঁপে ওঠে। যেমন গল্প সে শুনেছে তেমনই নাম। তখন সেই বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে করতে ভাবে সেই বাড়ির বৃদ্ধা মালিকের অসাধারণ ক্ষমতার কথা। যখন ঘুম তাকে অধিকার করে তখনই সে ফিরে আসে নিজের ঘরে। স্বপ্ন দেখে তিনটা কার্ড, সবুজ টেবিল, সে খেলছে। তারপর দেখে গোছা গোছা টাকা। সোনার টাকা সেইসব। সে ওর 'স্টেক' ডবল করছে আর রাশি রাশি টাকা উড়ছে। তারপর যখন ঘুম ভেঙে যায়, সেই স্বপ্নের টাকা থাকে না। বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর সে বাড়ি থেকে বের হয়ে সেই কাউন্টেসের বাড়ির সামনে চলে আসে। কোনো এক অজানা শক্তি তাকে টানতে থাকে। তারপর একটু থেমে সে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখে। কখনো দেখে কালো চুলের মাথা। সেখানে সেই কালো মাথার নারী কীসের ওপর যেন ঝুঁকে আছে। কোনো বই কি সেটা? তারপর সেই নারী যখন চোখ তোলে, হারমান দেখতে পায় সেই চোখ দুটো। দুজনের চোখ মিলে যায় দৃষ্টিতে। হয়তো সেই মহূর্তে তার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যায়। এই হলো লিজাভেটা ও হারমানের ব্যাপার।

তিন

যেই না লিজাভেটা তার শরীর থেকে কোট ও হ্যাট খুলেছে ঠিক তখনই কাউন্টেস তাকে আবার গাড়ি আনতে বলেন। ওরা আবার যায় গাড়িতে জায়গা করে নিতে। যখন লিজাভেটা কেবল কাউন্টেসকে দরজা পার করিয়ে গাড়ির পাদানিতে পা রেখেছে, লিজাভেটা দেখতে পায় সেই লোকটিকে, যাকে সে ইঞ্জিনিয়ার মনে করেছে। লোকটা তার হাত ধরে, ভয় পাওয়া লিজাভেটা কিছু বুঝতে না বুঝতে, মন থেকে এই দেখা হওয়ার ভয় তাড়াতে না তাড়াতে লোকটা হওয়া। কাউন্টেসের অভ্যাস হলো গাড়িতে বসে প্রশ্ন করা আমরা কোথায় চলেছি, এইটি কোন জায়গা এইসব। যে লোকটা গাড়ির পাশ দিয়ে গেল সে কে? ওই ব্রিজটার কী নাম? ওই যে বোর্ডটা টাঙানো, কী লেখা সেখানে। কিন্তু এখন লিজাভেটার উত্তর অসংলগ্ন।

ঘটনা কী তোমার মেয়ে? এমন ধুম মেরে বসে আছো কেন? কোনোকিছু দেখেছ নাকি, যা তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে? যা বলছি শুনছো? না তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না? ঈশ্বরের কৃপায় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক আছে আর আমার কথাবার্তা জড়ানো নয়।

লিজাভেটা সবকিছু শুনেও না শুনে বসে আছে। যখন বাড়িতে প্রবেশ করে সে সোজা নিজের ঘরে যায়। দস্তানার ভেতর থেকে লোকটার চিঠি বের করে—হাত ধরে লোকটা যে চিঠি দিয়েছিল। এই কারণেই লিজাভেটা সারা পথ খুব অন্যরকম ছিল। চিঠিটাতে গালা লাগানো হয়নি। ও সবটা খুব ভালো করে পড়ে। এই চিঠিতে যা লেখা তা ভালোবাসার কথা। কোনো এক জার্মান উপন্যাস থেকে তুলে নিয়ে লেখা। লিজাভেটা জার্মান জানে না। তারপরেও পড়ে বেশ খুশি হয়।

কিন্তু চিঠিটা তাকে খুব যন্ত্রণা দেয়। এই প্রথম সে জীবনে একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। একেবারে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ভালোবাসার সুচারু কোমল স্বীকারোক্তি। লোকটার এমন সাহস তাকে

ভীত করে। মনে হয়, চিঠি নেবার মতো ঘটনা বন্ধ করতে না পেরে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কী করবে ও এখন? জানালার পাশে বসা বন্ধ করে দেবে? সে কি জানালার পাশে না বসে সোজাসুজি লোকটাকে উপেক্ষা করবে? চিঠি কি ফেরত দেবে? না কঠিন ভাষায় একটা উত্তর লিখবে? কেউ নেই, যার সঙ্গে ও এসব নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কোনো মেয়ে বন্ধু বা আত্মীয়—কে আছে আমার? যে ঠিক করে উত্তর দেবে?

এবার সে ওর ছোট চিঠি লিখবার টেবিলে বসে। কাগজ-কলম নেয়। ভাবে কী সে লিখতে পারে। অনেকবার অনেকভাবে সে চিঠি শুরু করবার চেষ্টা করে। ছিঁড়ে ফেলে অনেকবার। মনে হয় এমন লেখাতে লোকটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। অনেক চেষ্টার পর যা লেখে তা ওকে খুশি করে।

> *আমার মনে হয় আপনার উদ্দেশ্য ভালো। তারপরেও আপনার এমন কাজে আমি খুশি হতে পারছি না। কারণ আমি চাই না আপনি আমাকে অপমান করেন। আমাদের দুজনে দুজনকে চোখে দেখার কারণে এমন চিঠি ঠিক নয়। আমি চিঠি ফেরত দেব। ভবিষ্যতে এমন বাজে কাজ বা সম্মানহানির কাজ আপনি আর করবেন না।*

পরদিন যখন দেখে হারমান জানালার পাশ দিয়ে হাঁটছে, সে ওর সেলাই বন্ধ করে সোজা বাইরের করিডোরে চলে যায়। চিঠিটা বাইরে ফেলে দেয়। মনে করে চিঠিটা লোকটা পেয়ে যাবে। লোকটা ছুটে এসে চিঠিটা হাতে নেয় এবং পাশের কেক-বিস্কুটের দোকানে চলে যায়। লোকটা আঠা খুলে লিজাভেটার চিঠি পড়ে। ও যা ভেবেছিল এইটা তার থেকে বেশি কিছু নয়। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে এবং এরপর সে কী করবে তা নিয়ে ভাবতে থাকে।

পরদিন এক সুচতুর নারী পোশাকের দোকান থেকে এসে লিজাভেটাকে একটা নোট বা চিরকুট দেয়।

মনে হয় আপনি ভুল করছেন, এই চিরকুট আমার নয়।

সেই মহিলা বেশ একটু ধূর্ত হাসি হেসে বলে, এইটা আপনারই

চিঠি। আপনি পড়তে পারেন। লিজাভেটা বলে, হতেই পারে না। সত্যি নাকি? এ চিঠি আমার! এই বলে সে চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করে।

যদি চিঠিটা আপনার নয় ভেবে থাকেন, তাহলে চিঠিটাকে টুকরো টুকরো করলেন কেন? না টুকরো টুকরো করলে যার চিঠি তাকে দিতে পারতাম।

আপনি মন দিয়ে শুনুন মিস, ভবিষ্যতে এমন চিঠি আর আমাকে দেবেন না। আর যে চিঠি দিয়েছে তাকে গিয়ে বলবেন, ওর এমন কাজের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

হারমান হাল ছাড়ে না। রোজদিন লিজাভেটা এমন চিঠি পেতে থাকে। একটার পর আর একটা। বর্তমান চিঠিগুলো জার্মান ভাষার তর্জমা নয়। হারমান তার আবেগে যা মনে হয় তা-ই লেখে। একেবারে কোনো বাধা না মেনে চিঠি আসতে থাকে। যা সে কল্পনা করছে এবং যা সে পেতে চায় সেই কথা ভেবে। এরপর যা হলো তা এই—লিজাভেটা চিঠি পড়তে লাগল এবং চিঠির উত্তর দিতে লাগল। এবং আস্তে আস্তে চিঠির ভাষা বদলে বেশ ভালোবাসার রংমাখা চিঠি হয়ে উঠল। আর চিঠিগুলো সে জানালা দিয়ে বাইরে সেই লোকটার জন্য ফেলে দিতে লাগল।

লিজাভেটা লেখে—

> *আজ রাতে অ্যাম্ব্যাসিতে নাচের আসর বসবে। কাউন্টেস সেখানে থাকবেন। তিনি রাত দুটোর পর আর থাকবেন না। তারপর আমি একা থাকব। তখন তোমার সুযোগ হবে আমাকে দেখার। যখন কাউন্টেস চলে যাবেন, তখন সব চাকরবাকরও চলে যাবে। হলঘরের পাহারাদার হয়তো বাইরে থাকবে। কিন্তু সচরাচর পাহারাদার তাদের নিজস্ব খুপরিতে চলে যায়। রাত সাড়ে এগারোটার সময় চলে এসো। তারপর যদি কেউ প্রশ্ন করে; বলবে, কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করবে। তিনি কি বাড়িতে। ওরা না বলতে পারে। এরপর আর কিছু করার নেই। তখন হয়তো আর কিছু দেখবে না। কাজের মেয়েরা সব এক ঘরে থাকে। লবি থেকে*